গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)- এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা ২৫ সেপ্টেম্বর - ১ অক্টোবর ২০১৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

বিধানসভার গেটে ছাত্র-যুব-মহিলাদের তুমুল বিক্ষোভ লাঠিচার্জে আহত ২১, গুরুতর ৬, গ্রেপ্তার ৬৩

পাশফেলের দাবিতে বিক্ষোভ

২১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বিধানসভার গেটে ছাত্র-যুব-মহিলাদের বিক্ষোভে র‍্যাফ সহ পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ করেছে। যাতে গুরুতর আহত ৬ জনকে হাসপাতলে ভর্তি করতে হয়েছে ২১ জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হন। ২৭ জন মহিলা সহ ৬৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অষ্টমশ্রেণি পর্যন্ত অবিলম্বে পাশ-ফেল চালু, নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং মদের ঢালাও প্রসার নীতির বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস। বিধানসভার অধিবেশন চলছিল, প্রত্যাশিত ছিল মন্ত্রীরা জনজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি বিক্ষোভকারীদের সামনে এসে শুনবেন এবং সরকারের বক্তব্য জানাবেন। কিন্তু দেখা গেল,

চারের পাতায় দেখুন

সাংস্কৃতিক সংগঠনের মুখোশ খুলে গেল আর এস এসের

২ সেপ্টেম্বর থেকে তিন দিন ধরে দিল্লিতে আর এস এস-বিজেপি সমন্বয় বৈঠক হয়ে গেল। বৈঠকে সঙ্ঘের ১৫টি সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে একের পর এক মন্ত্রীরা যেমন তাঁদের কাজের হিসেব দিয়েছেন, তেমনই প্রধানমন্ত্রী তাঁর কাজের হিসেব দেওয়া ছাড়াও বলেছেন, তিনি আর এস এসের একজন স্বয়ংসেবক হিসেবে নিজেকে গর্বিত মনে করেন। বলেছেন, সঙ্ঘের আদর্শই তাঁর মানসিকতা গড়ে দিয়েছে। বাস্তবিক গত এক বছরের বেশি সময় ধরে যেভাবে আর এস এস নেতাদের এবং বিজেপির মধ্যে আর এস এসের অনুগত নেতা-মন্ত্রীদের একের পর এক সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ, বিষোদগার দেখে-শুনেও তিনি চুপ করে থেকেছেন, যেভাবে এই বৈঠকে সদলবলে উপস্থিত হয়েছেন তাতে দেশের মানুষও নিঃসংশয় যে সঙ্ঘের আদর্শই প্রধানমন্ত্রী তথা তাঁর মন্ত্রীসভার আদর্শ।

আর এস এস নেতারা চিরকালই বলে এসেছেন, তাঁদের সংগঠনের সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। এটি একটি নিখাদ সাংস্কৃতিক সংগঠন। বাস্তবে আর এস এস যে একটি রাজনৈতিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আড়ালে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই তাঁরা চরিতার্থ করতে চায়, শাসক বিজেপির সাথে সমন্বয় বৈঠক তাকে পরিষ্কার করে দিল।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তথা আর এস এসের কী সে আদর্শ, যা নাকি প্রধানমন্ত্রীর মানসিকতা গড়ে দিয়েছে? তা কি প্রগতির আদর্শ? সেই আদর্শ কি দেশের কোটি কোটি গরিব নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত, শ্রমিক-কৃষক, সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্যাণকর? সেই আদর্শের চর্চার ফলে কি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে দুঃখ কষ্ট দারিদ্র শোষণ নির্যাতনে জর্জরিত, তার থেকে মুক্তি পাবে? দেশের লক্ষ লক্ষ নারী যে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে চলেছে, তার অবসান ঘটবে? লক্ষ লক্ষ কৃষকের আত্মহত্যার অবসান ঘটবে? সে আদর্শ কি বন্ধ কারখানার লক্ষ লক্ষ কর্মহীন শ্রমিকের জীবনে কোনও আশার আলো দেখাতে পারবে? না, এর

দুয়ের পাতায় দেখুন

সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করুন

কর্ণাটকের সভায় পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস উপলক্ষে কর্ণাটক রাজ্য কমিটি আহূত বাঙ্গালোরের সভায় ৮ আগস্ট কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ভাষণ প্রকাশ করা হল। অনুবাদে ত্রুটি থাকলে তার দায় আমাদের— গণদাবী।

মানবসমাজে মৃত্যু নতুন কোনও বিষয় নয়। সমাজের সূচনাকাল থেকেই জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই আছে। প্রতিটি মানুষের মৃত্যুই সমাজে একটি শূন্যতা সৃষ্টি করে। নতুন মানুষের জন্ম আবার এই শূন্যতাকে পূরণ করে দেয়। কিন্তু কোনও কোনও সময়ে, কোনও বিশেষ মৃত্যু এমন শূন্যতা সৃষ্টি করে, যা পূরণ করতে যুগের পর যুগ লেগে যায়। এমনই এক মৃত্যু ঘটেছিল ১৯৭৬ সালের ৫ আগস্ট। সর্বহারার মহান নেতা ও মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, আমাদের দলের নেতা ও শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনাবসান হয়েছিল ঐ দিন। খুব অল্প বয়সেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু স্বল্প জীবনকালের মধ্যেই তিনি একদিকে সর্বহারার প্রকৃত বিপ্লবী দল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-কে গড়ে তোলার জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন, অন্য দিকে বিপ্লবী চিন্তা, বিপ্লবের পথনির্দেশ এবং বিপ্লব সম্পর্কে একটি সামগ্রিক জ্ঞান ও ধারণা আমাদের দিয়েছেন। কীভাবে যেকোনও পরিস্থিতিকে বিপ্লবীরা মোকাবিলা করবে এবং একটা বিরূপ পরিস্থিতিকেও কী ধরনের সংগ্রামের দ্বারা কাটিয়ে উঠবে, সে সম্পর্কেও তিনি গাইডলাইন দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনেও যত সমস্যা ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তিনি সেগুলিরও উত্তর দিয়েছেন। ফলে, জ্ঞান ও জীবনের সকল ক্ষেত্রকে জড়িয়েই তাঁর চিন্তাধারা অবস্থান করছে। সকল ক্ষেত্রে তাঁর মহৎ অবদানগুলি নিয়ে একটি সভায় আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই, বিপ্লবের প্রশ্নে, বিশেষত ভারতের বিপ্লবের বিশেষ রূপ সম্পর্কে তাঁর পথনির্দেশক চিন্তা আপনাদের কাছে বলবার আমি চেষ্টা করব।

তিনের পাতায় দেখুন

সাংস্কৃতিক সংগঠনের মুখোশ খুলে গেল আর এস এসের

একের পাতার পর

কোনওটিই ঘটবে না। কারণ, এর কোনওটি নিয়েই আর এস এসের কোনও উদ্বেগ নেই। বাস্তবে আর এস এসের আদর্শ ঠিক এর উল্টো। তা দেশের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক। সেই অর্থে মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর। আর এস এসের দর্শন ইতিহাস সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা, যুক্তিহীনতা, প্রাচীন চিন্তা, বিজ্ঞান বিরোধিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এস এসের লক্ষ্য হচ্ছে, একটি বিশেষ ধর্মীয় চিন্তার ভিত্তিতে সরকার চালানো। তার আদর্শের মধ্যে রয়েছে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ। তারা শুধু হিন্দুত্বের নামেই রাষ্ট্রকে পরিচিত করতে চায় না, অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষকে তাদের পদানত রাখতে চায়। মহিলাদের সম্পর্কে আর এস এস মনোভাব চরম পুরুষতান্ত্রিক। মহিলাদের তারা রান্নাঘরের মধ্যে ঢোকাতে চায় হিটলারের মতো। তারা মহিলাদের রান্নাঘরে বন্দি করতে চায়।

আর এস এসের ইতিহাস দাঙ্গার ইতিহাস। শুরু থেকেই আর এস এসের হাত অন্য ধর্মের মানুষের রক্তে রঞ্জিত। গুজরাট দাঙ্গা তো বটেই, গত লোকসভা নির্বাচনের আগে গোটা উত্তর ভারত জুড়ে কয়েক শত দাঙ্গা বাধিয়েছে আর এস এস। এ সবেরই লক্ষ্য ছিল নির্বাচনে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা। সংখ্যালঘু মানুষদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা।

আর এস এসের ইতিহাস স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতার ইতিহাস, নবজাগরণ আন্দোলনকে বিরোধিতার ইতিহাস, ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার ইতিহাস। দেশের হাজার হাজার যুবক যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জেলে গেছে, অত্যাচারিত হয়েছে, ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছে, আর এস এস নেতারা তখন ব্রিটিশ আইনের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেছে, ব্রিটিশকে নানা ভাবে সাহায্য করেছে। শাসক ব্রিটিশও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করতে তাদের বিভেদ নীতির অঙ্গ হিসেবে আর এস এসকে মদত জুগিয়ে গেছে। তাদের এক নেতা তো ব্রিটিশের কাছে মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

আর এস এসের নীতিশিক্ষার ভিত্তি হল প্রাচীন, আজকের যুগে অকার্যকরী নীতি-নৈতিকতা— যাকে তারা 'সনাতনী' নাম দিয়ে চালাতে চায়। এ দেশে নবজাগরণের মনীষীরা, রামমোহন বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে তৎকালীন মহান ব্যক্তিরা সামন্তী সমাজের কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, অনাচার, ধর্মীয় অন্ধতা, অশিক্ষার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যুগোপযোগী যে নতুন নৈতিকতা ও গণতান্ত্রিক চেতনার জন্ম দিয়েছিলেন, আর এস এস নেতারা তাকে অস্বীকার করে। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে আর এস এস নেতারা দেশপ্রেম ও জাতীয়তা বলে মনে করতেন না। তাদের কাছে জাতীয়তার অর্থ ছিল একমাত্র মুসলমান বিরোধিতা। নবজাগরণের মাধ্যমে তৎকালীন সামাজিক নিপীড়ন থেকে মানুষকে রক্ষা করার সংগ্রামে গড়ে ওঠা মহান ব্যক্তিত্বদের মধ্যেও এরা নীতি-নৈতিকতা দেখতে পান না।

দেশকে তথা দেশের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিনির্ভর আধুনিক মনন গড়ে তোলার পরিবর্তে আর এস এস নেতারা এই সমন্বয় বৈঠকে শিক্ষার সিলেবাসে ইতিহাসকে হিন্দুত্বের রঙে রঞ্জিত করার তথা গৈরিকীকরণের দাবি জানিয়েছে বিজেপি মন্ত্রীদের কাছে। তারা চাইছে সংস্কৃতের মতো একটি প্রাচীন ভাষা, যা আজ আর কারও মাতৃভাষা নয়, যোগাযোগের ভাষা হিসেবে সমাজের কোনও অংশের মানুষের মধ্যে ব্যবহৃত হয় না, আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও উন্নততর জ্ঞানের জগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে না, তারই প্রচার ও প্রসার ঘটাতে সরকার উদ্যোগ নিক। তাদের দাবি, প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও বৈদিক অঙ্ক পাঠ্যসূচিতে ঢোকানো হোক। এ কথা সত্য যে, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে, গণিতের চর্চা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক গণিত বা বিজ্ঞান তো সেখানেই আটকে নেই, বহু দূর এগিয়ে গেছে! তা ছাড়া শুধু ভারতে কেন, বিশ্বের সমস্ত দেশে সমস্ত সমাজেই কম-বেশি, তাদের মতো করে বিজ্ঞান-গণিতের চর্চা হয়েছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস হিসেবে, গণিতের ইতিহাস হিসেবে সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের জন্য পাঠ্য করা যেতে পারে। কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে তার চর্চার আজ আর কোনও অর্থ আছে কি? কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে আর এস এস নেতাদের দাবি, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘ-ঘনিষ্ঠ লোকেদের বসানো হোক। কোনও রকম যোগ্যতা ছাড়াই শুধুমাত্র সঙ্ঘ-ঘনিষ্ঠতার সার্টিফিকেটেই তারা একের পর এক ব্যক্তিকে এমন প্রতিষ্ঠানগুলিতে বসানো শুরু করে দিয়েছে। দেশের প্রধান ইতিহাস গবেষণা সংগঠন আই সি এইচ আর-এর প্রধান হিসাবে বিজেপি ঘনিষ্ঠ ওয়াই সুদর্শন রাও-কে বসিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেমন ইতিহাসবিদ এই রাও? তিনি বলেছেন, মহাকাব্যেই জাতীয় ইতিহাসের সত্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে বিমান ওড়ানো, স্টেম সেল চিকিৎসা এবং পরমাণু অস্ত্র ছিল বলেও তিনি দাবি করেছেন। সম্প্রতি পুনের এফ টি আই আই-তে গজেন্দ্র চৌহানের নিয়োগ এর শেষ নিদর্শন। এ সব তো আর এস এসেরই অ্যাজেন্ডা, যা প্রধানমন্ত্রী কার্যকর করছেন।

আর এস এসের এজেন্ডা হল, সভ্যতাকে এমন করে পিছনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা। আসলে এর পিছনে রয়েছে শাসক শ্রেণির সুগভীর পরিকল্পনা। অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদ সংকট থেকে রেহাইয়ের কোনও রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছে না। বিপরীতে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি গোটা সমাজকে আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করেছে। উপযুক্ত আদর্শ ও নেতৃত্ব পেলে তা যে কোনও মুহূর্তে ফেটে পড়বে এবং শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধেই সেই বিস্ফোরণ ঘটবে। মানুষের এই ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ থেকে রেহাই পেতে, পুঁজিবাদী শোষণকে আড়াল করতে, শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের সংগ্রামকে দুর্বল করতে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি শোষিত, বিক্ষুব্ধ জনগণকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত করতে চায়— যাতে তারা ধর্মের নামে, জাত্যাভিমানের নামে মিথ্যা অহংয়ের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে। বাস্তবিক এই হচ্ছে ফ্যাসিবাদ। মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ এ প্রসঙ্গে অনেক আগেই বলেছিলেন, "ফ্যাসিবাদ হচ্ছে একটা সর্বাত্মক প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান। একদিকে সে মানুষের চিন্তাভাবনাগুলোকে মেরে দিয়ে তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, ... অপরদিকে যত অধ্যাত্মবাদ, সেকেলে যত রকমের কুসংস্কার, যত যুক্তিহীন মানসিকতা ও অন্ধতাকে গড়ে তোলে। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ, তমসাচ্ছন্ন ভাবনা ধারণা এবং যুক্তিহীনতার সাথে কারিগরি বৈজ্ঞানিক বিদ্যার অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এরকম ঘটনা যখন দেশে ঘটে তখন যুক্তিবাদী মন দেশে মরে যায়।" সংকটগ্রস্ত ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে আর এস এস দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েমের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে চলেছে।

এমন যে আর এস এস, তার সাথে একটি নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রীদের কীসের সম্পর্ক? বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে কোথাও ছিল না, দেশটা আর এস এসের নির্দেশ মেনে চলবে। ভারতীয় সংবিধানের শপথ নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন নরেন্দ্র মোদি। আর এস এসের মতো একটি সাম্প্রদায়িক, বিভেদকামী, ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে বিপজ্জনক একটি সংগঠনের কাছে মন্ত্রীসভার এমন জবাবদিহির দ্বারা সেই সংবিধানকেই লঙ্ঘন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতাদের গণতন্ত্রের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা থাকলে মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছে, তাকে এমন করে লঙ্ঘন করতে পারতেন না। তাদের এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ দেশের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ মেনে নেবে না।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রামের পার্টির আবেদনকারী সদস্য কমরেড জাবেদ আলি জমাদার ৪ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স

হয়েছিল ৬২ বছর। বেশ কিছু দিন ধরে তিনি কিডনির রোগে ভুগছিলেন। সাতের দশকে প্রথম দিকে তিনি ডি এস ও-র মাধ্যমে ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন। কলেজের নানা আন্দোলনে যুক্ত থাকতে গিয়ে ছাত্র পরিষদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন। পরবর্তীকালে দলের মিটিং-মিছিল ও স্থানীয় জনমুখী আন্দোলনে তিনি সর্বদা ভূমিকা নিয়েছেন। ২০০৩ সালে স্থানীয় আমতলা মতিরাম হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সহ সভাপতি ও ২০০৬ সালে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। বিদ্যালয়ের ও পঞ্চায়েতের কাজকর্মের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে এলাকার শত শত মানুষ ছুটে আসেন, খবর পাওয়ামাত্র উপস্থিত হন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাদল সরদার, গোপালপুর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড ইয়াহিয়া আখন্দ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ৫ সেপ্টেম্বর প্রায় সহস্রাধিক মানুষ তাঁর শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন সৎ, একনিষ্ঠ ও দরদি কমরেডকে হারাল।

কমরেড জাবেদ আলি জমাদার
লাল সেলাম

কেশিয়াড়িতে কে কে এম এস-এর বিক্ষোভ

দীর্ঘদিন বৃষ্টি নেই, মাঠের জমি ফুটিফাটা, ধানগাছ শুকিয়ে লাল হয়ে গেছে। এ সমস্যা পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন ব্লকে থাকলেও কেশিয়াড়ি ব্লকে তা তীব্র আকার ধারণ করেছে। অবিলম্বে খরা প্রতিরোধে সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ, উপযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ রেখে ২৪ ঘন্টা মিনি ও ডিপটিউবওয়েল চালু, নষ্ট হয়ে যাওয়া ধানজমিতে বিকল্প চাষের ব্যবস্থা ও বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, খাজনা ও কৃষিঋণ মুকুবের দাবিতে ১০ সেপ্টেম্বর এ আই কে কে এম এস এর পক্ষ থেকে কেশিয়াড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। দুই শতাধিক কৃষক মিছিল করে প্রথমে বিদ্যুৎ দপ্তর, এ ডি এ দপ্তর এবং পরে বি ডি ও দপ্তরে ডেপুটেশন দেন। নেতৃত্ব দেন কমরেডস প্রদীপ দাস, স্নেহাশিষ আইচ, শিবশংকর পাত্র প্রমুখ।

মুরারই বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

খাদ্য সুরক্ষা আইনে সমস্ত গরিব মানুষকে রেশন কার্ড প্রদান, রেশন কার্ডের জন্য ফর্ম পূরণের সময়সীমা বৃদ্ধি, মদের ঢালাও লাইসেন্স প্রদান বন্ধ ও চোলাই মদের ভাটি উচ্ছেদ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষিতে সস্তাদরে বিদ্যুৎ প্রদান, মুরারই-মিত্রপুর রাস্তা সংস্কার প্রভৃতি দাবিতে ৯ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি) -র পক্ষ থেকে বীরভূম জেলার মুরারই ২ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এই কর্মসূচি উপলক্ষে সমস্ত ব্লক জুড়ে প্রচার করা হয় এবং দুটি গণকমিটি গঠিত হয়।

বিডিও স্থানীয় দাবিগুলি পূরণ এবং রেশন কার্ড দেওয়ার তালিকা প্রস্তুত করার বিষয়টি যাতে স্বচ্ছভাবে হয় সে ব্যাপারে প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেন। এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রফিকুল হাসান।

পাশফেল চালুর যুক্তি মানলেন রাজ্যপাল

১৬ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদল রাজভবনে দাবিপত্র পেশ করতে গেলে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, পাশফেল চালু করা উচিত— এই কথা মেনে নেন। পাশফেল প্রবর্তন ছাড়াও এদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আংশিক কর্মী নিয়োগ, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান, প্রস্তাবিত ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করা, সুষ্ঠুভাবে শিক্ষক নিয়োগ, 'টেট' প্রশ্ন ফাঁসে জড়িতদের শাস্তি, বৈজ্ঞানিক-ধর্মনিরপেক্ষ সিলেবাস প্রণয়ন, শিক্ষক নিগ্রহ বন্ধ ইত্যাদি দাবিও তুলে ধরা হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সমিতির সভাপতি কার্তিক সাহা, সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা, সুনীল ঘোষ, মেঘনাথ খামরই, জয়ন্ত খাটুয়া প্রমুখ।

চিটফান্ড এজেন্ট ও আমানতকারীদের পাঁশকুড়ায় বিক্ষোভ

অল বেঙ্গল চিটফান্ড ডিপোজিটারস অ্যান্ড এজেন্টস ফোরাম এর উদ্যোগে ১৪ সেপ্টেম্বর চিটফান্ড আমানতকারীদের সুদ সহ টাকা ফেরত ও নিরপরাধ এজেন্টদের নিরাপত্তার দাবিতে তিন শতাধিক এজেন্ট ও আমানতকারী পাঁশকুড়া পুরাতন বাজার মোড় থেকে মিছিল করে পাঁশকুড়া থানায় যান এবং ও সিকে স্মারকলিপি পেশ করেন। বিডিও অফিসেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাঁপুই, জেলা সভাপতি প্রদীপ দাস, জেলা সম্পাদক অশোকতরু প্রধান প্রমুখ।

কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাধারা আত্মস্থ করুন

একের পাতার পর

বিপ্লব কী

বিপ্লব মানে কী? বিপ্লব সম্পর্কে জনগণের নানারকম ধারণা রয়েছে। তারা যখন জীবনে সংকটের সামনে পড়ে, অত্যন্ত কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়, যার সহজে সমাধান করা যায় না, তখন তারা বলে, আমাদের বিপ্লব দরকার, বিপ্লবই একমাত্র সমাধান। কিন্তু বিপ্লবের অর্থ তারা কি বোঝে? অবশ্যই বোঝে না। কিছু মানুষ হয়ত বুঝেছে, কিন্তু বহু মানুষই বোঝে না বিপ্লব মানে কী। আবার জনগণেরই একটি অংশ বিপ্লবের প্রবল বিরোধী। তারা মনে করে বিপ্লব মানে নৈরাজ্য, বিপ্লব মানে ব্যক্তিহত্যা। যদি আমরা বিপ্লবের মানে না বুঝি, তবে আমরা বিপ্লব করতে পারব না। কিন্তু আমাদের তো বিপ্লব করতে হবে। ফলে, সকল কমরেডদের, বিশেষত তরুণ ও প্রাণবন্ত যেসব কমরেডরা পার্টিতে সদ্য যোগ দিয়েছে, তাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে, আমরা সবাই কী উদ্দেশ্যে লড়াই করছি। বিপ্লব বলতে ঠিক কী বোঝায়? আরও বিশেষভাবে বললে, ভারতের বিপ্লবের চরিত্র কী? তাই এ সংক্রান্ত কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আমি আপনাদের সামনে রাখছি।

প্রকৃতি, সমাজ কিংবা জীবন— সমগ্র বিশ্বজগতেই আমরা দেখি, প্রত্যেকটি জিনিস পরিবর্তিত হয়, প্রত্যেকটি জিনিসই নিয়ত গতির মধ্যে অবস্থান করে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া দুটি। একটি হল পরিমাণগত পরিবর্তন,— ধীর পরিবর্তন, বিবর্তনমূলক পরিবর্তন। অপরটি হল, গুণগত পরিবর্তন, হঠাৎ আচমকা পরিবর্তন, সমগ্র জিনিসটা পরিবর্তিত হয়ে একটি নতুন কিছুতে রূপান্তরিত হওয়া। মার্কসবাদী পরিভাষায় একে আমরা বলি, পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে গুণগত পরিবর্তন ঘটা। এই যে গুণগত পরিবর্তন, যা কোনও জিনিসকে সমগ্রতায় পাল্টে দিয়ে সকল দিক দিয়ে একটি নতুন জিনিসে পরিবর্তিত করে, তাকেই আমরা বলি বিপ্লব। সুতরাং বিপ্লব কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। প্রকৃতিতে, সমাজে, জীবনে এবং চিন্তাতেও প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় বিপ্লব ঘটছে।

মানুষ সাধারণ ভাবে মনে করে, বিপ্লব বুঝি শুধু মানব সমাজেই সংঘটিত হয়। না, কেবলমাত্র মানবসমাজেই নয়, প্রকৃতিতেও বিপ্লব ঘটে। মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটে। খুব খুঁটিয়ে দেখলে, এটা আমরা সহজেই বুঝতে পারব। যেমন ধরুন, কোনও উর্বর জমিতে যদি গমের বীজ বপন করা হয়, তা যদি প্রয়োজনীয় জল, বাতাস ও সূর্যের কিরণ পায়, তা হলে আমরা দেখব কিছুদিন পর সেখানে গমের অঙ্কুর বেরিয়েছে এবং আরও কিছুদিন পর দেখা যাবে গমের বীজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে সেখানে গমের চারাগাছ দেখা দিয়েছে। এই যে নতুন পর্যায় যখন গমের বীজ থেকে সম্পূর্ণ নতুন গুণসম্পন্ন গমের চারা জন্ম নিল, সেই মুহূর্তটা হচ্ছে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের, যাকে আমরা বলব বিপ্লব ঘটল। সকল বস্তুর ক্ষেত্রেই আমরা এটা দেখি। এমনকী অতি শক্ত পাথরেরও পরিবর্তন হয়। প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই পরিবর্তন আছে। বস্তু ও বস্তুজগতের অস্তিত্বই রয়েছে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং তা সবসময়ই পরিমাণগত থেকে গুণগত পরিবর্তন। বীজ থেকে চারা একদিনে তৈরি হয়নি। ধীরে ও ক্রমে ক্রমে তা পরিমাণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়ে হঠাৎ গুণগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, অর্থাৎ বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছে। সমাজজীবনেও বিপ্লবের পথটা ওই প্রকৃতিজগতের মতোই, যদিও হুবহু একরকম নয়। দুটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন একরকম হতে পারে না। বিজ্ঞানে এ কথা আমরা জানি। ফলে, সমাজে বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে আমাদের বুঝতে হবে।

সমাজবিপ্লবের প্রক্রিয়া

প্রকৃতিতে আমরা দেখি পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে আপনা-আপনিই ঘটে। যদি বিশেষ কোনও বাধা না আসে, যেমন বপন করা বীজ যেখানে জল-বাতাস আলো পেল না, তেমন ঘটনা ছাড়া প্রকৃতিতে পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন আপনা আপনিই ঘটে যায়। কিন্তু সমাজে যদিও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া একই, তবুও সেখানে পরিবর্তন আপনাআপনি ঘটে না, বিশেষত শ্রেণি বিভক্ত সমাজে যেখানে দুটি শ্রেণি আছে— একটি শোষক শ্রেণি, যারা শাসন করে, অপরটি শোষিত শ্রেণি যারা শাসিত, শোষিত, নিপীড়িত ও অবদমিত হয়, সেখানে বিপ্লব আপনাআপনি ঘটতে পারে না। এখানে একটি নতুন উপাদান অবশ্যই প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে মানুষের চেতনা। মানুষের সচেতন সংগ্রাম ছাড়া সমাজবিপ্লব হতে পারে না। লেনিন বলেছেন, 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া, সঠিক বিপ্লবী দল ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না'।

এ কথা কেন বললেন? আমরা সর্বহারারা, বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সমাজে আমরাই একমাত্র শক্তি নয়। এখানে রাষ্ট্রক্ষমতায় আছে পুঁজিপতি শ্রেণি। টাটা বিড়লা গোয়েঙ্কা আম্বানি আদানি এরা ও অন্যরা মিলে সামগ্রিকভাবে যে পুঁজিপতি শ্রেণি, তারা রয়েছে রাষ্ট্র ক্ষমতায়। রাষ্ট্র মানে সেনাবাহিনী, পুলিশ, আমলাতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রকে ব্যবহার করেই শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করে। সমাজে যখন প্রতিরোধ বেড়ে ওঠে, তখন তাকে ভাঙবার জন্য, বন্ধ করার জন্য শাসক শ্রেণি বাধা তৈরি করে। একে পরাস্ত করার জন্য আমাদের মহৎ বিপ্লবী চিন্তা চাই। শোষিত জনগণের এমন ধরনের বিপ্লবী সংগঠন আমাদের দরকার, যা শাসক শ্রেণির আক্রমণ সইতে পারে— শুধু পুলিশ নয়, সেনাবাহিনীকেও পরাস্ত করতে পারে। এই ধরনের সচেতন রাজনৈতিক শক্তি যখন সমাজে গড়ে ওঠে, তখনই কেবল সামাজিক বিপ্লব সম্ভব হয়। সুতরাং বিপ্লব মানে নৈরাজ্য বা আজগুবি ধারণা নয়। আমরা বলছি, সচেতন সংগঠিত সর্বহারা বিপ্লবের কথা, জনগণের সচেতন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা, যার মানে কিছু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিহত্যা নয়, যেটা নকশালবাদীরা কিছু কিছু এলাকায় করে যাচ্ছে। সচেতন সংগঠিত গণঅভ্যুত্থান হচ্ছে বিপ্লব।

হিংসা ও বিপ্লব

অনেক সময়ই বলা হয়, আমরা নাকি হিংসায় ইন্ধন দিই। এ কথা জনগণ বলেন না। শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি ও তাদের দালালরা প্রচার করে বিপ্লব মানে নৈরাজ্য এবং তা হিংসায় উস্কানি দেয়, হিংসা ডেকে আনে। এ কথা সত্য নয়। শ্রমিক শ্রেণি কখনই হিংসা ডেকে আনে না। তারা হিংসা চায় না। তা হলে আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলি কেন? কারণ, আমাদের মতো একটি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে হিংসা আছে। শ্রমিক শ্রেণি যখন সচেতন ভাবে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে, তাকে কারা দমন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে? সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। তারা যদি দমন করতে না পারে, তখন নিয়োগ করা হয় সেনাবাহিনী। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সেনাবাহিনী গড়ে তোলা ও পোষাই হয় সর্বহারা শ্রেণি ও নিপীড়িত জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য। শাসক শ্রেণি ও তাদের সেবাদাসরা বলে, দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখার জন্য, বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সেনাবাহিনীর প্রয়োজন। খরা, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করা, সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনী দরকার। এই প্রচার জনগণকে বিভ্রান্ত করে দেয়। কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রে সেনাবাহিনীকে রাখাই হয় শেষপর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার ও বিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য। শ্রমিক ও শোষিত জনগণ যদি সচেতন ও সংগঠিত হয়, যদি তারা সমাজের স্বার্থেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত হয়, তবে তাদের অবশ্যই শাসক শ্রেণির সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে হবে। অর্থাৎ হিংসা ঘটবেই। এই হিংসা তো বুর্জোয়া রাষ্ট্রই ডেকে আনে। কিন্তু তার দায় বা দোষ শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি চাপিয়ে দেয় শ্রমিক শ্রেণি ও শোষিত জনগণের উপর। ফরাসি বিপ্লবে হিংসা হয়নি? কমিউনিস্টরা করেছিল নাকি? তখন তো কমিউনিস্টদের জন্মই হয়নি। ঐ হিংসা তো বুর্জোয়ারাই করেছিল। ওটা তো ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব। রোবসপিয়ের, যিনি নিজে গিলোটিনের আবিষ্কারক, তাকেই গিলোটিনে প্রাণ দিতে হল। ঐ যে হিংসা, মৃত্যু, তা কি দোষের ছিল? না, দোষের ছিল না। মানুষকে হত্যা করা কি ভালো? আমার বক্তব্য সেটা নয়। বিপ্লবে বহু মানুষ মারা যাবে, কারণ শাসক-শোষক শ্রেণির ভাড়াটে সেনাবাহিনী যখন গুলি চালাবে, দমন-পীড়ন চালাবে তখন বহু নিরীহ মানুষেরও প্রাণ যাবে। এখানে মূল কথাটা হল, বিপ্লবের পথে এই যে রক্তপাত, মৃত্যু— এ কি সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক, এক নতুন ও উন্নততর সভ্যতা প্রতিষ্ঠার দিকে সমাজকে নিয়ে যায়, একটি মহত্তর সমাজ প্রতিষ্ঠা করে যেখানে মানুষ পুরনো দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়? যদি সেটা হয়, তবে এই রক্তপাতও স্বাগত। তবে এই হিংসা মহৎ। আমরা রক্তপাত চাই না। এটা বুর্জোয়ারা চাপিয়ে দেয় যখনই শ্রমজীবী জনগণ সচেতন ও সংগঠিত হয়ে বিপ্লবের পথে পা বাড়ায়। বুর্জোয়াদের সেনাবাহিনী তখন দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়, যেটাই বিপ্লব।

সুতরাং আমরা দেখছি, যতদিন রাষ্ট্রক্ষমতায় শোষক বুর্জোয়া শ্রেণি থাকবে, ততদিন বিপ্লব সশস্ত্র ও হিংসাত্মক না হয়ে পারে না। সকল বিপ্লবই কি হিংসাত্মক হয়? না, কখনই তা নয়। যখন আদিম স্যাভেজ সমাজ ধীরে ধীরে ও শেষপর্যন্ত গুণগত পরিবর্তনের পথে বর্বর যুগে পদার্পণ করল, তখন বিপ্লব ছিল শান্তিপূর্ণ। কারণ, তখন ক্ষমতায় কোনও নিপীড়ক শ্রেণি ছিল না, যার নিজেকে রক্ষা করার জন্য বিপ্লবকে ধ্বংস করার প্রয়োজন ছিল। আবার, শ্রমিক শ্রেণি যখন রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবে ও সর্বহারার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সেখানে থাকবে সর্বহারার একনায়কত্ব। এরপর সমাজতান্ত্রিক সমাজের যখন সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটবে, তখন তাকে আটকাবার কোনও শক্তি, কোনও অস্ত্র থাকবে না। বরং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসক সর্বহারা শ্রেণি নিজেরাই সমাজের ঐ রূপান্তর বা বিপ্লব চাইবে। ফলে, তা হবে শান্তিপূর্ণ। তা হলে কোথায় কোথায় আমরা বিপ্লবকে হিংসাত্মক দেখব? যে সমাজে রাষ্ট্রক্ষমতায় শোষক শ্রেণি অধিষ্ঠিত— সেটা সামন্ততন্ত্র বা দাসযুগ অথবা পুঁজিবাদ হতে পারে। ফলে, আমরা দেখলাম, সর্বহারা বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণির সচেতন ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু সচেতন সর্বহারার ভূমিকা নয়, সংগঠিত সর্বহারার ভূমিকা। এর দ্বারাই বুর্জোয়া শ্রেণিকে ক্ষমতাচ্যুত করে সর্বহারা শ্রেণি সমাজতন্ত্র তথা সর্বহারা শ্রেণির শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। সে হবে এক মহৎ সভ্যতা। আমাদের জীবনে আজ পুঁজিবাদ যেসব সমস্যা সংকট সৃষ্টি করেছে, তার সমাধান ঘটাবে সমাজতন্ত্র। এ হল এক মহান সমাজবিপ্লব।

ভারতীয় বিপ্লবের স্তর

এখন আমি ভারতের বিপ্লবের চরিত্র নিয়ে কিছু বলব। কমরেড শিবদাস ঘোষ তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা দেখিয়েছেন, ভারতের বিপ্লবের চরিত্র হল পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক। এ কথা বলতে কী বোঝায়, বিচার করে দেখা যাক। প্রথমত আমাদের বুঝতে হবে ভারতবর্ষ একটি পুঁজিবাদী দেশ। ভারত একটি পুঁজিবাদী দেশ কি না তা নিয়ে আমাদের দেশের তথাকথিত কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে কোনও একটিও ভারতকে পুঁজিবাদী দেশ বলে মনে করে না। অথচ, ভারত তো শুধু একটি পুঁজিবাদী দেশই নয়, যথেষ্ট শক্তিশালী একটি পুঁজিবাদী দেশ— যার জাতীয় বুর্জোয়ারা, একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীগুলি সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। এর মানে কী? এর মানে হল ভারতীয় পুঁজিপতিরা চূড়ান্ত মুনাফার জন্য এখন অন্যান্য গরিব দেশগুলিতে পুঁজি রপ্তানি করে ঐ সব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সস্তা শ্রমশক্তিকে লুট করছে। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে পুঁজি রপ্তানি করত। তারা এ দেশে সরাসরি সামরিক শাসন কায়েম করেছিল ও তার মধ্য দিয়ে ভারতের বাজারকে লুট করত। ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণি আজ সেই একই ভূমিকা পালন করছে। যদিও তারা অন্য কোনও দেশকে সামরিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না। বর্তমানে কোনও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র— ইংল্যান্ড ফ্রান্স বা জার্মানি বা আমেরিকা যেই হোক, তার পক্ষে অন্য কোনও দেশকে সামরিক দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ফিনান্স পুঁজি রপ্তানির মাধ্যমে এক দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা অন্য দেশের সস্তা শ্রমশক্তি ও সস্তা কাঁচামাল লুট করে, ভারতীয় বুর্জোয়ারাও একই জিনিস করছে। ফলে, ভারত কেবলমাত্র একটি পুঁজিবাদী দেশ নয়, একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে একটি ছোট সুপার পাওয়ার। এভাবেই সর্বপ্রথম আমাদের বুঝতে হবে, ভারত একটি পুঁজিবাদী দেশ। এরপর আমাদের বুঝতে হবে, এখানে বিপ্লবের চরিত্র কী?

লেনিন দেখিয়েছেন, সমাজবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবের মূল প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন। যখন নিপীড়িত শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে, বিপ্লব ঘটে তখন। পুরনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস ও একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া সর্বহারা শ্রেণি বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারে না। তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে ভাঙতে হবে এবং সর্বহারা শ্রেণির নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটা কেন করতে হবে? ইতিপূর্বেকার সকল রাষ্ট্রই— তা দাস-প্রভু রাষ্ট্র, সামন্তী রাষ্ট্র অথবা বুর্জোয়া রাষ্ট্রই হোক, ওগুলি ছিল শোষণমূলক রাষ্ট্র। ওইসব শোষণমূলক রাষ্ট্রকে সংস্কার করে অথবা উন্নত করে সর্বহারা শ্রেণি তার নিজের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এ হবে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্র, যা সমাজকে শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য সর্বহারা শ্রেণিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পূর্বেকার শোষণমূলক রাষ্ট্রগুলি থেকে এই নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে সর্বাত্মকভাবে গুণগত দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান সুনিশ্চিত করবে এই নতুন রাষ্ট্র। পুঁজিবাদে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হয়ে থাকে। কলকারখানায় মালিক পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শোষণ করে। শ্রমিকের

পাঁচের পাতায় দেখুন

ডিজেলের দাম কমেছে, অবিলম্বে বাস ভাড়া কমানোর দাবিতে

২১ সেপ্টেম্বর জেলায় জেলায় বিক্ষোভ, পথ অবরোধে আক্রমণ

পুরুলিয়া শহরে গোশালা মোড়ে অবরোধ

উত্তর চব্বিশ পরগণার হাবড়ায় পথ অবরোধ

তমলুক শহরে অবরোধ

বালুরঘাটে অবরোধে গ্রেপ্তার

হুগলির শ্রীরামপুরে জি টি রোড অবরোধ

বিধানসভার গেটে তুমুল বিক্ষোভ

একের পাতার পর

গণতান্ত্রিক এই প্রক্রিয়ায় সরকার নেই। পূর্বতন সব সরকারের মতোই তৃণমূল সরকারও আন্দোলনকারীদের জবাব দিল পুলিশ ও র‍্যাফ পাঠিয়ে।

সারা দেশজুড়ে পাশ-ফেল চালুর দাবিতে জনমত তৈরি হয়েছে, তার চাপে কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে। ২০টি রাজ্য সরকার এতে মত দিলেও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী এখনও টালবাহানা করছেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক। সংবাদে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত রাজ্যের ২০১৩-১৪ সালের উৎকর্ষ অভিযানের সমীক্ষা বলছে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ৩৪ শতাংশ পড়ুয়া রিডিং পড়তে শেখেনি। অষ্টম শ্রেণির ৭৫ শতাংশ পড়ুয়া সহজ ইংরেজি বাক্য পড়তে পারে না। এই তথ্য জানা সত্ত্বেও সরকার পাশ-ফেল চালুর প্রশ্নে গড়িমসি করছে। সরকার শিক্ষার আর কত ক্ষতি করতে চায়?

প্রতি কিলোমিটারে দুটি করে মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দিচ্ছে রাজ্য সরকার। তারা শুধু রাজস্ব বৃদ্ধির হিসাবই দেখছে, সমাজে তার কুপ্রভাব বিশেষ করে মহিলাদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে আদৌ ভাবিত নয়। মদ, অশ্লীল বিজ্ঞাপন এবং পর্নোগ্রাফির প্রভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। শিশু থেকে বৃদ্ধা কারওরই রেহাই নেই। এ রাজ্যে ধর্ষকেরা কেউ শাস্তি পায়নি। চরম লজ্জার হল, নারী পাচার-শিশু পাচারে এ রাজ্য সর্বোচ্চ স্থানে। আন্দোলনকারী সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার এইদাবিগুলি পূরণে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। আন্দোলনের উপর পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে ২২ সেপ্টেম্বর সারা রাজ্যে ধিক্কার দিবস পালিত হয়।

কলকাতা মেডিকেল কলেজে পুলিশের আক্রমণে আহত ছাত্রযুব কর্মীদের অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে

পুলিশি আক্রমণের নিন্দায় কমরেড সৌমেন বসু

২১ সেপ্টেম্বর বিধানসভার গেটে ছাত্র-যুব-মহিলা বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ঐ দিনই এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ দাবি পূরণে তৎপর না হয়ে আন্দোলন দমনের সরকারি তৎপরতার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করছি। ২২ সেপ্টেম্বর রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালন করার আহ্বান জানাচ্ছি।

একই দিনে জেলায় জেলায় বাসভাড়া কমানোর দাবিতে শতাধিক স্থানে পথ অবরোধ সংগঠিত হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা এবং জলপাইগুড়ির বেরুবাড়ি মোড়ে অবরোধকারীদের ওপর তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। এই হামলার তীব্র নিন্দা করছি।

নার্সের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন মামলা, নার্সেস ইউনিটির প্রতিবাদ

সম্প্রতি বালুরঘাট হাসপাতালের নার্স রাখি সরকার একটি সদ্যোজাত শিশুর চ্যানেল কাটতে গিয়ে বুড়ো আঙুলের ডগার সামান্য অংশ কেটে ফেলেন। ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনার সত্যাসত্য বিচার করে ওই নার্সের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তৎসত্ত্বেও বিপজ্জনক অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করার অভিযোগ এনে পুলিশ তাঁকে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করে। নার্সেস ইউনিটি তদন্ত করে জানতে পারে, বাচ্চাটির হাত পচন থেকে বাঁচাতে চ্যানেল খোলা প্রয়োজন ছিল। তা করতে গিয়েই ওই অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা ঘটে। এমনকী ওই নার্স চ্যানেল খোলার সময় ফোনে কথা বলছিলেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে তাও ঠিক নয়। এই গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ জানায় নার্সেস ইউনিটি।

সংগঠনের সম্পাদিকা সিস্টার পার্বতী পাল ও সহ সম্পাদিকা সিস্টার ভাস্বতী মুখার্জীর নেতৃত্বে বালুরঘাট হাসপাতাল ও সংলগ্ন গঙ্গাধরপুর হাসপাতালের নার্সরা রোগী পরিষেবা বজায় রেখে টানা দু'দিন অবস্থান চালান। এছাড়া রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে কালো ব্যাজ পরিধান এবং জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল, কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতাল ও বালুরঘাট হাসপাতালে প্রতিবাদী মৌন মিছিল করেন নার্সরা।

সর্বহারা শ্রেণি সচেতন ও সংগঠিত না হলে বিপ্লব হয় না

তিনের পাতার পর

শ্রমশক্তিকে মালিকরা ক্রয় করে এবং তাদের কারখানায় নিয়োগ করে যৎসামান্য মজুরি দেয়, উৎপাদনের বাকি ফসলটা মুনাফা রূপে পকেটস্থ করে। সমাজতন্ত্রে এই শোষণটা থাকবে না যেহেতু শ্রমিকরাই হবে উৎপাদনযন্ত্রের মালিক। এ হবে এক নতুন সমাজ, যেখানে সকল উৎপাদনযন্ত্র থাকবে সর্বহারা রাষ্ট্রের পরিচালনায়, সমাজের নিয়ন্ত্রণে। এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদন হবে সমাজের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাতে, মুনাফা করার জন্য নয়। এই সমাজ হবে সম্পূর্ণ আলাদা ও উন্নততর। এ কথা বুঝলে আমরা ভারতের বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট চরিত্রটি ধরতে পারব।

বিপ্লবের মূল প্রশ্ন যে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন—লেনিনের এই শিক্ষা আগেই উল্লেখ করেছি। স্ট্যালিন এই শিক্ষাকে আরও বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন— প্রথম আমাদের দেখতে হবে কোন শ্রেণি বা শ্রেণিগুলি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন, কোন বিপ্লবী শ্রেণি অন্যান্য কোন কোন শ্রেণির সাথে যুক্ত হয়ে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে। এটাই হচ্ছে বিপ্লবের প্রধান প্রশ্ন। কারা শাসক শ্রেণি ও কারা শাসিত শ্রেণি, তা চিহ্নিত করতে হবে ও বুঝতে হবে শাসিত শ্রেণিগুলির মধ্যে কোন শ্রেণি সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক, যারাই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে। এই দিকটিকে সুনির্দিষ্টভাবে বুঝতে পারাই হচ্ছে একটি বিশেষ দেশের বিপ্লবকে বুঝতে পারা। আমাদের দেশে যখন ১৯৪৮ সালে আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখান যে, ১৯৪৭ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এদেশের সামন্তী জমিদার এবং মহীশূর, পাতিয়ালা বা হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রভৃতি দেশীয় রাজাদের সাথে হাত মিলিয়ে ভারতকে শাসন করেছে। এ ধরনের প্রায় ৫০০ অঙ্গরাজ্যের রাজারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তা দিয়েছিল। অর্থাৎ সে সময় দেশীয় সামন্ততন্ত্রের সাথে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ছিল রাষ্ট্রক্ষমতায়। তাহলে সে সময় বিপ্লবের শক্তি কারা ছিল? এ বিষয়ে আমি যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটা করব, নতুন কমরেডদের পক্ষে তা বোঝা কঠিন হতে পারে। আমি যতটা সম্ভব সহজ ভাবেই বলতে চেষ্টা করব, তবুও যদি নতুন কমরেডদের তা বুঝতে অসুবিধা হয়, তবে পরে রাজ্য নেতাদের কাছ থেকে তারা বুঝে নেবেন। টাটা বিড়লা গোয়েঙ্কারা আজ যেমন এ দেশের ক্ষমতায় আছে, সে সময় তা ছিল না। আগেই বলেছি তখন ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, সাথে ছিল আঞ্চলিক সামন্তী জমিদাররা। ভারতীয় বুর্জোয়ারা ভারতীয় বাজার ও তার সাথে রাষ্ট্রের দখল নিজেদের হাতে নিতে চাইছিল। এই লক্ষ্য থেকে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। ভারতের এই জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি ছিল কংগ্রেস। কিন্তু ততদিনে পুঁজিবাদ আন্তর্জাতিকভাবেই তার বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছে ক্ষয়িষ্ণু মুমূর্ষু ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। ফলে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো জায়গায় আর পুঁজিবাদ ছিল না। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে, বিশেষ করে আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী ও দেশীয় সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি যতদূর যেতে সক্ষম, ততদূর যাওয়ার অর্থে তার একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। আবার বিশ্ব বুর্জোয়া শ্রেণির অংশ হিসাবে ভারতীয় বুর্জোয়ারা সর্বহারা বিপ্লবের আশঙ্কায় চরম ভীত ছিল। সর্বহারার তখন শ্রেণি হিসাবে কেবল আবির্ভাবই ঘটেনি, তারা শ্রেণি হিসাবে নিজেদের সংগঠিত করেছে। বিশেষ করে রাশিয়ায় সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণি সর্বহারা বিপ্লবও সম্পন্ন করেছে। তাই বিপ্লবভীত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি একদিকে ভারতীয় বাজারের দখল নেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, অন্যদিকে বিপ্লব আটকাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপসও করেছে। তারা ভারতীয় সমাজের গণতন্ত্রীকরণের জন্য কোনও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলেনি, তারা আচারে অভ্যাসে সংস্কৃতিতে সামন্তী যুগের অবশেষ জনগণের মধ্যে টিকে থাকতে দিয়েছে। কারণ যদি এই পুরনো অচল সামন্তী আচার অভ্যাস ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করত তাহলে তা এমন এক সংগ্রামের সূচনা ঘটাত যাতে সর্বহারা শ্রেণি সামনে চলে আসত। এই ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির ভূমিকা। মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, মাস্টারদা সূর্য সেন ও আরও অনেক বিপ্লবী স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের পথ অনুসরণ করেছিলেন যেখানে কংগ্রেসের পথ ছিল আপসমুখী। এভাবে আপসমুখী ও আপসহীন দুটি শক্তিই স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিল। দুঃখের কথা, স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লববাদীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিই কংগ্রেসের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দখল করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতি মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের বিজয় নিশ্চিত করে দেয়। সমগ্র পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, চীনও মুক্ত হয়। এইভাবে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উত্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আতঙ্কিত করে। তাই তারা ভারতে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেয়, যাতে ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা অন্তত তাদের বৈমাত্রেয় ভাইদের হাতে থাকে, সর্বহারা শ্রেণির হাতে চলে না যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আরও কিছু বছর ভারতে থাকতে ও শাসন করতে পারত। কিন্তু তারা এ কথা ভেবে ভীত হল যে, ভারতে তখন যে বিপ্লবী আন্দোলন বাড়ছিল, তা যদি আরও শক্তিসঞ্চয় করে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে যায়, তবে তা শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দেশছাড়া করবে তাই নয়, ভারতীয়

বক্তব্য রাখছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

পুঁজিপতিদেরও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে দেবে না। সর্বহারা শ্রেণি ক্ষমতা দখল করে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে মৈত্রী ও ঐক্য গড়বে। এজন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বুদ্ধি করে ভারতীয় বুর্জোয়াদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেয়। তাই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ছিল ক্ষমতার হস্তান্তর, শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর। বহু মানুষই বুঝতে পারেন না যে, এও ছিল যথার্থই একটা বিপ্লব। রাষ্ট্রক্ষমতা যখন সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তী জমিদার জোটের কাছ থেকে জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে গেল, তখন সেটা বিপ্লবই। এটাই ভারতবর্ষে ঘটেছিল।

এভাবে যে বিপ্লব ঘটল, কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন সেটা ছিল খণ্ডিত ও আধসেঁকা রুটির মতো। এরপর থেকে ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে একটি পুরোপুরি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এই সত্য অতীতে অবিভক্ত সিপিআই ও পরে বিভক্ত সিপিআই, সিপিএম ও নকশালপন্থীরা বুঝতে পারেনি। লেনিনের শিক্ষা উল্লেখ করে কমরেড ঘোষ দেখান, বিপ্লবের আগে রাশিয়ার অবস্থাও ছিল অনেকটাই ব্রিটিশ শাসিত ভারতের মতো। রাশিয়া শিল্পে খুব উন্নত ছিল না, কৃষিকাজই ছিল প্রধান অবলম্বন। এজন্য ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর অনেকেই মনে করেছিলেন, রাশিয়া পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের পথে যাবে না। কিন্তু লেনিন দেখালেন, যে মুহূর্তে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা জারের কাছ থেকে রুশ বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে গেল, তৎক্ষণাৎ তত দূর অর্থেই রাশিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হল এবং রাশিয়া পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে প্রবেশ করল। তিনি বলেন যে, এক শ্রেণির হাত থেকে অন্য শ্রেণির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা যাওয়া ইতিহাস, রাজনীতি ও বিজ্ঞানের দিক থেকে অবশ্যই একটি বিপ্লব। লেনিনের শিক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতের পরিস্থিতি বিচার করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে —আপসের মধ্য দিয়েই হোক এবং খণ্ডিত ও আধসেঁকা রুটির মতোই হোক— ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে এসেছে, তখন বলতেই হবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়েছে এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়েছে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি। কারা বুর্জোয়াদের হটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার দখল নেবে? তারা হচ্ছে কৃষিমজুর ও শিল্পশ্রমিকদের নিয়ে গঠিত ভারতের সর্বহারা শ্রেণি। এরাই সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণি। এই শ্রেণির নেতৃত্বেই অর্ধসর্বহারা গরিব চাষি, ছুতোর মিস্ত্রির মতো দক্ষ শ্রমিকরা বিপ্লবের জন্য দাঁড়াবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে জয় করে বিপ্লবের পক্ষে আনবে এবং শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করবে। তাই আমাদের বিপ্লব হচ্ছে পুরোপুরি পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। মূল লক্ষ্যই হল রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে সর্বহারার শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

বিপ্লব কখন হয়

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে গভীরভাবে বোঝা দরকার। একটি দেশের চলমান অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাটি যতক্ষণ না পুরনো, ক্ষয়িষ্ণু, মৃতপ্রায় হয়ে পড়ছে, ততক্ষণ সে দেশে বিপ্লব হতে পারে না। সেখানে যত লড়াই-ই করা হোক, যত কথাই বলা হোক না কেন, বিপ্লব আপনারা করতে পারবেন না। কিন্তু যখন পুরনো ব্যবস্থাটি ক্ষয়িষ্ণু, মুমূর্ষু ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে এবং পুরনো অচল ব্যবস্থাটিকে হঠিয়ে দিয়ে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করবে যে নতুন উদীয়মান বিপ্লবী শক্তি, তা যখন ক্ষমতা দখলের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে, তখনই বিপ্লব হতে পারে, তার আগে নয়। বিকাশের যুগে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন গণতান্ত্রিক জীবন, নতুন সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল, সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবাধ বিকাশের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছিল, অসংখ্য শিল্প কল-কারখানা তৈরি করার দ্বারা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, মার্কসবাদের শিক্ষা অনুযায়ী লেনিন দেখিয়েছেন, গত শতকের শুরুতে সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছে ক্ষয়িষ্ণু, মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। এই ব্যবস্থা এখন শুধু জনজীবনে সমস্যা আর সংকটের জন্ম দিতে পারে। মৃতপ্রায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কোনও সমস্যারই আজ সমাধান করতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতাও তাই বলে। সমাজে একটার পর একটা সংকট। শিক্ষা সংস্কৃতি নৈতিকতা রুচি অর্থনীতি রাজনীতি সমাজজীবন — কোনওটাই সংকটমুক্ত নয়। এর জন্য কে দায়ী? কংগ্রেস বা বিজেপি — কোনও একটি সরকার, কিংবা মনমোহন সিং বা নরেন্দ্র মোদির মতো কোনও একজন ব্যক্তি কি এর জন্য দায়ী? কোনও একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল এর জন্য দায়ী নয়। দায়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যা নিজেই প্রতিক্রিয়াশীল অচল ও মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে এবং এই কারণেই সমস্ত সংকটের মূল কারণে পরিণত হয়েছে। এই পুরনো হয়ে যাওয়া প্রতিক্রিয়াশীল মুমূর্ষু দুর্নীতিগ্রস্ত ও জনবিরোধী ব্যবস্থাটির যারাই সেবা করে চলেছে, তারাই কংগ্রেস বিজেপি ও অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির মতো দুর্নীতিগ্রস্ত ও প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য।

আমি আগে বলেছি, আমরা শুধু চাই বলেই বিপ্লব আসবে না। বিপ্লব হবে তখনই যখন শ্রমিক শ্রেণি শুধু জন্ম নিয়েছে তাই নয়, পরিণত হয়েছে, সচেতন ও সংগঠিত হয়েছে এবং পুরনো প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে দিয়ে নতুন সমাজ গড়ে তোলার মতো ক্ষমতা অর্জন করেছে। বিপ্লব আসন্ন, বিপ্লব সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে আছে যে দিন শ্রমিক শ্রেণি সচেতন ভাবে বিপ্লবের পক্ষে দাঁড়াবে। সমাজ আজ কাঁদছে, শুধু আমাদের দেশে নয়, সর্বত্র। সমস্ত অগ্রসর সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন — সংকট তাদের সকলকে ঘিরে রয়েছে। গ্রিসে আজ কী হচ্ছে? সংকট অকল্পনীয় আকার ধারণ করে দেশটিকে গ্রাস করেছে। বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানকে বিক্রি করে দিচ্ছে, কারণ তাদের তারা পালন করতে পারবে না! অর্থনৈতিক-সামাজিক-নৈতিক সংকট কী তীব্র আকার ধারণ করলে মা তার সন্তানকে বেচে দিতে পারে! স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, গোটা আরব দুনিয়ার দিকে তাকান। সর্বত্রই একই সংকট। সর্বত্রই বিশাল বিশাল গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। কেন? কারণ, নির্মম পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। কত বড় বড় শক্তিশালী আন্দোলন ব্যাপক সম্ভাবনা নিয়ে ফুঁসে উঠছে। কিন্তু বিপ্লব হচ্ছে না। আন্দোলনগুলিও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। এরকম হচ্ছে কেন? লেনিনের অমূল্য শিক্ষার মধ্যে এর উত্তর আছে। লেনিন দেখিয়েছিলেন, বিপ্লবী তত্ত্ব ও বিপ্লবী পার্টি ছাড়া বিপ্লব হতে পারে না। ভারতে সেই একইরকম প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আছে। সেই একই প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। এ দেশে বিপ্লবের শত্রু কারা? শত্রু হল টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, আদানি, আম্বানিরা — যারা জাতীয় বুর্জোয়া, হোমোজিনিয়াস বুর্জোয়া শ্রেণি। এখানে বিপ্লবের শক্তি কারা? বিপ্লবের শক্তি হল সর্বহারারা — গ্রামীণ সর্বহারা (খেতমজুর) ও শহরে সর্বহারা (কারখানার শ্রমিক)। বিপ্লবের জন্য এদের সংগঠিত করতে হবে। বিপ্লবের বন্ধু কারা? তারা হল

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ভাষণ

পাঁচের পাতার পর

জনগণের আধা-সর্বহারা অংশ, যেমন গ্রামের ছোট জমির মালিক, যারা নিজের জমির আয়ে সংসার চালাতে পারে না বলে বাকি সময় অন্যের জমিতে খাটে। এদের মধ্যে চাষির বৈশিষ্ট্য যেমন আছে, তেমনই মজুরি-দাসের বৈশিষ্ট্যও আছে। এ জন্য এদের বলা হয় আধা সর্বহারা জনতা। আমাদের দেশের গ্রামীণ জনগণের একটা বড় অংশ হল এই আধা সর্বহারা জনতা। শহর অঞ্চলেও তেমনই মুচি, ছুতোর, তাঁতি প্রভৃতি যারা নিজেদের শ্রমে পণ্য উৎপাদন করে বিক্রি করে, তাদেরও সংগঠিত করা দরকার এবং এইভাবে সর্বহারা ও আধা সর্বহারা মানুষের ঐক্য গড়ে তোলা দরকার। বিপ্লবের এই শক্তি ও মিত্ররা মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে জয় করে তাদের বিপ্লবের পক্ষে দাঁড় করাবে অথবা অন্তত বিপ্লবের সহমর্মী নিরপেক্ষ শক্তিতে পরিণত করবে। এ হলে তবেই বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করা যাবে এবং বিপ্লবের উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাবে। এ না করেই হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়া হল হঠকারিতা। নকশাল বন্ধুরা এ কথা বোঝেন না। তাঁরা জনগণকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত না করেই হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। এবং এই কারণেই বিপ্লব বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে রক্তপাত, ব্যক্তিহত্যা। এই সমস্ত কিছুই আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।

সিপিআই(এম)-এর ভুল লাইন

সিপিআই(এম)-এর রাজনৈতিক লাইনটি কী? সিপিআই(এম)-এর সমস্ত বিশ্লেষণটাই হাস্যকর রকমের তালগোল পাকানো। ভারত যে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, তা তারা স্বীকার করে না। তারা বলে ভারত এখনও একটি উপনিবেশ। তা হলে ভারত রাষ্ট্রের চরিত্রটি কী? আজকের দিনে মাত্র দু'ধরনের রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকতে পারে— আমেরিকা, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ প্রভৃতির মতো বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্র এবং উত্তর কোরিয়া ও কিউবার মতো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (কিউবার পরিস্থিতিও খুব ভালো নয়। কখন তার পতন ঘটবে, আমরা জানি না। বেদনাদায়ক হলেও সেই দিনটির জন্য আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই)। সুতরাং, দু'ধরনের রাষ্ট্র থাকতে পারে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এদের মাঝামাঝি কিছু নেই। সিপিআই(এম) ভারতকে যদি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার না করে এবং নিশ্চিতভাবেই তারা এই দেশটিকে সমাজতান্ত্রিক দেশও বলবে না, তাহলে তাদের মতে ভারত রাষ্ট্রটির চরিত্র কী? ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা কী বলে, লক্ষ করুন। তারা বলে, ভারত বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন একটি বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র। শ্রেণি সমঝোতা ছাড়া এ আর কিছু নয়। এরকম কোনও রাষ্ট্র গোটা দুনিয়ার কোথাও নেই। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং-এর শিক্ষার ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে ভারত বৃহৎ পুঁজিপতিদের নেতৃত্বাধীন পুঁজিপতি-জমিদার রাষ্ট্র, তাহলেও এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পুঁজিবাদ। বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্র কথাটির অর্থ হল, ভারত একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। সিপিআই(এম)-এর এ কথা মানা উচিত। কিন্তু তারা মানে না। তাদের ফর্মুলা অনুযায়ী চিন, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, উত্তর কোরিয়ার মতো ভারতেও তারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করবে। এই দেশগুলিতে আধা-সর্বহারা ও জাতীয় বুর্জোয়াদের সাহায্য নিয়ে বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণি লড়াই করেছিল বৈদেশিক আগ্রাসন ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে। সিপিআই(এম)-এর এই ফর্মুলায় বিশ্বাস করতে হলে এদেশের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিকে প্রগতিশীল আখ্যা দিতে হয় এবং তাদের বিপ্লবের সহযোগী হিসাবে ধরতে হয়। ঠিক এই কথাটাই সিপিআই(এম) বলে। তারা বলে, এদেশে বুর্জোয়া শ্রেণি বিপ্লবের মিত্রশক্তি। তাহলে কার বিরুদ্ধে তারা লড়বে, কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে? পুঁজিবাদের এই সহজ নিয়মটাই তারা বোঝে না যে, বৃহৎ বুর্জোয়ারা আছে মানেই ছোট পুঁজিপতিরাও আছে। এই ছোট পুঁজিপতিদেরই তারা জাতীয় বুর্জোয়া বলে দেখায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ছোট পুঁজিপতিরা কেন বৃহৎ পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়ে? কারণ, বৃহৎ বুর্জোয়ারা ছোট পুঁজিপতিদের বড় হতে দিতে চায় না। তাই বৃহৎ পুঁজিপতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই ছোট পুঁজিপতিরা বড় পুঁজিমালিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ছোট পুঁজিও বিলুপ্ত হবে। তাহলে ছোট পুঁজিপতিরা বিপ্লবের পাশে দাঁড়াবে কেন? এই বুনিয়াদি বিষয়টি সিপিআই(এম) বোঝে না। ফলে তাদের বিপ্লবী লাইন হল একটা জগাখিচুড়ি, গোলমেলে, এর সমস্তটাই অস্পষ্ট। বোধহয় এই কারণেই তারা 'জাতীয় বুর্জোয়াদের দল কংগ্রেস'-এর সঙ্গে জোট করার কথা বলে 'বৃহৎ বুর্জোয়াদের দল বিজেপি'-র বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। বাস্তবে বৃহৎ বুর্জোয়ারা কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েরই পৃষ্ঠপোষকতা করে, সাহায্য করে। স্বাধীনতার আগে থেকেই বৃহৎ বুর্জোয়ারা কংগ্রেসকে সমর্থন করে আসছে। সিপিআই(এম) এভাবে বিপ্লবের শত্রুদের মিত্র বানিয়েছে এবং এর দ্বারা শ্রমিক শ্রেণিকে বিভ্রান্ত করেছে। এই কারণেই ভোটের সময় তারা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলায়। এবং এটা মেনে নিতে না পেরে দলের কর্মীদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন তাঁরা জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে জোট গড়বেন। তাঁদের এখনই বিপ্লব শুরু করা উচিত। নেতৃত্বের সঙ্গে এই নিয়ে মতবিরোধকে ভিত্তি করে দলের বিক্ষুব্ধ অংশ দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে হঠকারিতা শুরু করলেন। এভাবেই ঐক্যবদ্ধ সিপিআই ভেঙে সিপিআই ও সিপিআই(এম)— এই দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর পর সিপিআই(এম) যখন কংগ্রেসের হাত ধরে নির্বাচনে লড়া শুরু করল তখন তাদের থেকে বেরিয়ে গিয়ে একদল গঠন করলেন সিপিআই(এম এল)। এভাবেই হয় তাঁরা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদে অথবা বামপন্থী হঠকারিতার পথে ভেসে যাচ্ছেন। তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, এই দুই লাইনের কোনওটির সঙ্গেই বিপ্লব করার কোনও সম্পর্ক নেই। সিপিআই এবং সিপিআই(এম)-এর মধ্যেকার পার্থক্য হল এই যে, সিপিআই(এম) যেখানে বলে, যে যুক্তফ্রন্ট বিপ্লব করবে তার নেতৃত্ব দেবে সর্বহারা শ্রেণি এবং এই অর্থে এটি হবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, সেখানে সিপিআই-এর বক্তব্য একই হলেও পার্থক্য হল, তারা বলে সর্বহারা শ্রেণি জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে নিয়ে বিপ্লব সফল করবে। ফলে তা হবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। সিপিআই(এম এল) ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করে না। এদের সকলের ব্যাখ্যাই ভুল। তবে এদের মধ্যে সিপিআই(এম এল)-এর অন্তত স্পষ্ট তত্ত্বগত অবস্থান আছে। তারা বলে, ভারত আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এখানে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এরা সকলেই ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। ভারত রাষ্ট্র সমস্ত দিক থেকেই একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং এখানে যে বিপ্লব হবে তা হল পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এ কথা গভীরভাবে আমাদের বুঝতে হবে এবং এই বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে সর্বাঙ্গীণ সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনা করা। এই কারণেই কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে আমরা জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্তকারী সর্বাঙ্গীণ বিপ্লবের ধারণা পেয়েছি। তিনি শিখিয়েছেন কেমন করে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়, কেমন করে যোগ্য বিপ্লবী হিসাবে গড়ে উঠতে হয় এবং বিপ্লব করার জন্য এই ধরনের আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়। সিপিআই, সিপিআই(এম) এবং সিপিআই(এম এল), এরা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব কী, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব কী ইত্যাদি সমস্ত বিষয় গুলিয়ে ফেলে। সাংস্কৃতিক দিকগুলিকে তারা কখনও আলোচনার মধ্যেই আনে না। বিপ্লবী কাকে বলে, এ সম্পর্কে তাদের যথাযথ ধারণা নেই। ওদের লেখাপত্র পড়ুন, দেখবেন এ সংক্রান্ত কোনও কিছুই আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না। এভাবে এ দেশের মাটিতে তারা কখনওই বিপ্লব সংঘটিত করতে পারবে না। যেকোনও মানুষ বিপ্লব করতে পারে না। কেবলমাত্র যথার্থ বিপ্লবীরাই বিপ্লব করতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে যথার্থ বিপ্লবী কারা।

এস ইউ সি আই (সি) এবং অন্যান্য মার্কসবাদী নামধারী পার্টিগুলির মধ্যে পার্থক্য

বিপ্লবের পথ সম্পর্কে আমাদের দলের বক্তব্যের সঙ্গে, নিজেদের যারা মার্কসবাদী বলে, সেই দলগুলির বক্তব্যের পার্থক্য খুব গভীরভাবে বুঝতে হবে। এইসব দলগুলি আগেও করেছে এবং এখনও ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। এরা সব বড় বড় দল। একসময় এরা স্ট্যালিন এবং মাও সে-তুঙের মতো মহান নেতাদের সমর্থন পেয়েছিল। যেকোনও নতুন দেশে নামের সঙ্গে 'কমিউনিস্ট' শব্দটি যুক্ত করে কোনও নতুন দল তৈরি হলেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব তাকে স্বীকৃতি দিয়ে দিতেন। কিন্তু এই দলগুলি আদৌ কমিউনিস্ট পার্টি কি না, মার্কসবাদী বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দেশটির সর্বহারা শ্রেণিরই তা বিচার করা উচিত। অত্যন্ত সঠিক ভাবেই কমরেড শিবদাস ঘোষ এ কথা বলেছিলেন। এখন এইসব দলগুলির রাজনীতি ও আচার-আচরণ দেখে সাধারণ মানুষ এত বিরক্ত হয়ে পড়েছেন যে, তাঁরা 'কমিউনিস্ট' শব্দটির উপরেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছেন। আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রুশ্চেভপন্থী সংশোধনবাদীরা ও পরবর্তীকালে দেং-জিয়াওপিংপন্থী সংশোধনবাদীরা সমাজতন্ত্র ধ্বংস করার পর এবং আমাদের দেশে একদিকে সিপিআই, সিপিআই(এম)-এর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, অন্যদিকে নকশালপন্থীদের বামপন্থী হঠকারিতা বিপ্লব ও কমিউনিজমের প্রশ্নে যখন ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, তখন জনসাধারণের সামনে সংগ্রামের সঠিক পথ তুলে ধরতে হবে আমাদের। বাস্তব ঘটনা হল এই যে, আমরা যেহেতু সংগ্রামের সঠিক পথ দেখাচ্ছি, জীবন সম্পর্কে উচ্চতর ধ্যান-ধারণার দিক নির্দেশ করছি এবং রুচি ও নৈতিকতার প্রশ্নে স্বচ্ছ ধারণার অবতারণা করছি, তাই মানুষ আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। আমি আপনাদের সামনে যেভাবে দেখালাম, সে রকম স্পষ্টভাবে কি মানুষ আমাদের রাজনৈতিক লাইন বুঝতে পারছেন? তাঁরা কি সিপিআই, সিপিআই(এম) এবং সিপিআই(এম এল)-এর মধ্যেকার পার্থক্য ধরতে পারছেন? তাঁরা কি বুঝতে পারছেন, কোন দিক দিয়ে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মূলগত ভাবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের থেকে আলাদা? এত সহজে তাদের পক্ষে এগুলি বোঝা সম্ভব নয়। আমাদের কাজ হল তাঁদের বোঝানো। কিন্তু তাঁরা আমাদের দলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। বাস্তব হল, আমাদের পার্টি বড় হচ্ছে। কেন এবং কীভাবে এ ঘটনা ঘটছে? কারণ, এ দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সংস্কৃতি মানুষ লক্ষ করছেন। নেতা-কর্মীদের জ্ঞান, আত্মোৎসর্গের মনোভাব, ত্যাগ করার মানসিকতা, বিপ্লবের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য, তাঁদের আন্তরিকতা এবং সততা মানুষ লক্ষ করছেন। এগুলি তাঁদের আকর্ষণ করে। দলের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মানুষজন সহজে বুঝতে পারেন এমন ভাষায় বিপ্লবের ধারণা তাঁদের কাছে আমাদের রাখতে হবে। বিপ্লব সম্পর্কে না বুঝলে বিপ্লবের পক্ষে তাঁরা দাঁড়াতে পারেন না। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ কী, কেন পুঁজিবাদ আজ মুমূর্ষু ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে, এ যদি তাঁরা না বোঝেন, তাহলে এর বিরুদ্ধে তাঁরা লড়বেন কেন? সমাজতন্ত্র কাকে বলে, পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক পার্থক্য কোথায়, সমাজতন্ত্রে কেমনভাবে জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান হবে, কমিউনিজমের দিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কীভাবে অগ্রসর হবে, কোন রাজনৈতিক দল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সেই পার্টিকে চেনা যাবে কী করে, কেমনভাবে বিপ্লব হবে — এ সমস্ত প্রশ্নগুলি মানুষ যদি না বোঝেন, তাহলে তাঁরা বিপ্লবের পক্ষে দাঁড়াবেন কেমন করে? এখানে আমি আজ যা যা বললাম, সবই আমাদের পার্টির বইপত্রে আছে। কিন্তু আজ প্রয়োজন হল, এই কথাগুলি বার বার বলা, বার বার এগুলি স্মরণ করা এবং অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাগুলি চর্চা করা। কারণ, আমাদেরই এই কথাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের সম্পর্কে কে জনগণকে জানাবে? বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম কি জনসাধারণের কাছে আমাদের রাজনৈতিক লাইন পৌঁছে দেবে? বুর্জোয়ারা কি আমাদের কোনও প্রচার দেবে? কমরেড ঘোষ বলতেন, বিপ্লবীদের নিজেদের ঢাক নিজে পেটাতে হবে। ভালো প্রচারক হওয়ার শৈলী আমাদের নিজেদেরই আয়ত্ত করতে হবে। মিটিং, মুখপত্র ও পত্রপত্রিকায় বিপ্লবের পথ প্রচার করার সাথে সাথে মুখে মুখে নিজেদের চারপাশে থাকা মানুষজন, বন্ধুবান্ধবের কাছেও এসব কথা নিয়ে যেতে হবে, যাতে তাঁরা নিজেরাও একমত হয়ে নিজের নিজের বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের কাছে আমাদের কথা প্রচার করেন। এই পথেই আমাদের দলের চিন্তা ছড়িয়ে পড়বে। এইভাবে গোটা দেশের মানুষের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা আমরা পৌঁছে দিতে পারব। অতএব, কমরেডস, এটাই হল আজকের সংগ্রাম।

বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও সংশয় অবশ্যই দূর করতে হবে

কিন্তু জনসাধারণের কাছে বিপ্লবের চিন্তা পৌঁছে দেওয়ার আগে তাঁদের মন আমাদের বুঝতে হবে। এমনকী যাঁদের আমাদের বক্তব্য সম্পর্কে আস্থা আছে, তাঁদের অনেকের মধ্যেও কমিউনিজম সম্পর্কে বিভ্রান্তি আছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। একটু সময় লাগতে পারে, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আপনাদের। প্রথমত, অনেকে প্রশ্ন করেন, 'রাশিয়া চিনের মতো দেশে যখন সমাজতন্ত্র টিকতে পারল না, তখন আমরা সমাজতন্ত্রের জন্য লড়ছি কেন? সমাজতন্ত্র টিকবে না, পুঁজিবাদ টিকবে। পুঁজিবাদ আরও বহু বছর টিকে থাকবে। কত শত বছর ধরে এই ব্যবস্থা টিকে আছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কিছু ভুলত্রুটি আছে, অপূর্ণতা আছে ঠিকই। সেগুলিকে আমাদের সংস্কার করতে হবে, সংশোধন করতে হবে। কিন্তু পুঁজিবাদই হল চূড়ান্ত। সমাজতন্ত্র সমস্যার সমাধান করতে পারে না'। এই কথার উত্তর কী হবে? সংক্ষেপে এর উত্তরের যুক্তিধারাটি আমি রাখছি। প্রয়োজন হলে নেতাদের

সাতের পাতায় দেখুন

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ভাষণ

ছয়ের পাতার পর

সঙ্গে আপনারা বিস্তৃত আলোচনা করে নেবেন। বিপ্লবের শেষ ধাপ সমাজতন্ত্র নয়। এটা বিপ্লবের একটা স্তর। পুঁজিপতি শ্রেণি এবং সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে সংগ্রাম চলছে। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণি শাসন করে এবং শ্রমিক শ্রেণি শাসিত, নিপীড়িত ও শোষিত হয়। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে পুঁজিপতি শ্রেণিকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বহারা শ্রেণি যখন ক্ষমতা দখল করে, এমনকী তখনও পুঁজিবাদ বিলুপ্ত হয় না। পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদ খুব ভালো ভাবেই টিকে থাকে। কিন্তু ক্ষমতায় থাকে না। লেনিন দেখিয়েছেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরাজিত পুঁজিবাদ গোটা বিশ্বের পুঁজিপতি শ্রেণি ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলে। এই কারণেই সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদের শক্তি, ক্ষমতায় থাকার সময়ে যতখানি ছিল, তার তুলনায় অনেক গুণ বেশি বেড়ে যায়। তারা পুনরায় ক্ষমতা দখল করতে প্রতিবিপ্লব ঘটানোর জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে কঠোর পরিশ্রম করে। ফলে, শ্রমিক শ্রেণি যদি সচেতন হয়ে সতর্ক প্রহরা না রাখে, যদি না শ্রমিক শ্রেণির সাংস্কৃতিক মান, চিন্তার স্তর ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে, তবে কোনও একদিন অসতর্ক অবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণি প্রত্যাঘাত করবে এবং শ্রমিক শ্রেণিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবে। ঠিক এই ঘটনাই পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে ঘটেছে। যতদিন স্ট্যালিন এবং মাও-এর মতো মহান কমিউনিস্ট নেতারা জীবিত ছিলেন, ততদিন বুর্জোয়া শ্রেণি প্রতিবিপ্লব ঘটাতে পারেনি। এই মহান বিপ্লবী নেতারা জানতেন যে, যদি মানুষ সতর্ক না হয়, আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন না থাকে, তাদের সাংস্কৃতিক মান যদি প্রয়োজনের অনুপাতে নিচু থাকে, আদর্শগত মানের উন্নতি না ঘটে, তাহলে বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ ও তাঁর দলবল ক্ষমতা দখল করল। লুকিয়ে থাকা বুর্জোয়া শ্রেণি, দলত্যাগীরা ধীরে ধীরে একে একে ক্ষমতায় এসে সমাজ অগ্রগতির পথটিকে বিপরীত দিকে চালিত করল। ৩০-৩৫ বছরের মধ্যে প্রতিবিপ্লব সমাপ্ত হল।

সঠিক মার্কসবাদী পথ অনুসৃত না হলে প্রতিবিপ্লবের বিপদ সম্পর্কে সকল মার্কসবাদী নেতৃত্বই সাবধান করেছিলেন

ফলে, সর্বহারা শ্রেণি ক্ষমতায় থাকলেও যতদিন সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণির অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন সংগ্রাম চলবে। শ্রমিক শ্রেণি এই সংগ্রামে ঢিলা দিলেই প্রতিবিপ্লব ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও এ বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভ যখন ক্ষমতায় বসেন, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ বার বার এ বিষয়ে সতর্ক করে প্রতিবিপ্লব রুখতে সংশোধনবাদী লাইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কথা বলেছেন। কিন্তু সেই সংগ্রাম করা হয়নি। যখন বিপ্লব সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হবে, যখন সমাজ থেকে শ্রেণিগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, বুর্জোয়া শ্রেণি ও সর্বহারা শ্রেণি — কোনওটিরই অস্তিত্ব থাকবে না, কেবলমাত্র তখনই প্রতিবিপ্লব ঘটার আর কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। কমিউনিজমে পৌঁছাবার পথে সমাজতন্ত্র হল মধ্যবর্তী ধাপ। সমাজতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি যদি আত্মস্থ করা যায় এবং ক্রমাগত তার উন্নয়ন ঘটানো যায়, তবে অগ্রগতির পথে চলতে চলতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ থেকে কমিউনিজমে পৌঁছানো সম্ভব। এই সংগ্রামে অবহেলা ঘটলে প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা থেকে যায়। প্রতিটি বিপ্লবেই অগ্রগতি যেমন আছে, পিছু হঠাও রয়েছে। বিজয় যেমন আছে, পরাজয়ও আছে। ফলে রাশিয়া ও চিনে সমাজতন্ত্রের মাত্র একবার পরাজয়ের অর্থ সংগ্রাম শেষ হয়ে যাওয়া নয়। যা ঘটেছে সেটাই চূড়ান্ত বা শেষ নয়। শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্ব রয়েছে। শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র মৃতপ্রায়। এর আয়ু শেষ হয়ে গেছে। ভেন্টিলেটার যন্ত্রের সাহায্যে বাইরে থেকে অক্সিজেন দিয়ে কোনও রকমে এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। যদি শ্রমিক শ্রেণি সচেতনভাবে সংঘবদ্ধ হয়, বিশ্বের প্রতিটি দেশ থেকে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে দেওয়া যাবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফলে, প্রতিবিপ্লব নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। রাশিয়া ও চিন উভয় দেশের ক্ষেত্রেই প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনা ছিল। লেনিন বলেছিলেন, 'সমাজতন্ত্রের অর্থ শ্রেণিগুলির বিলুপ্তি'। কিন্তু শ্রেণিগুলিকে বিলোপ করা যায়নি। শ্রেণিগুলির অস্তিত্ব ছিলই, শুধু তাদের পারস্পরিক ভূমিকার বদল ঘটেছিল। পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করা হয়েছিল কিন্তু বিলোপ করা হয়নি। এরকম পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা থেকেই যায় এবং তাই ঘটেছে। এ জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। আবার সংগ্রাম হবে এবং ওই রাশিয়াতেই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আবার সমাজতন্ত্র ফিরে আসবে। পুঁজিবাদ জীবনের সংকটগুলির সমাধান করতে পারে না।

বিপ্লব আপনা-আপনি হয় না

এখানে আরও একটি প্রশ্ন বুঝতে হবে। শুধু সংকট থাকলেই কি বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী? সংকট বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু শুধু শোষণ-পীড়ন বিপ্লব ঘটাতে পারে না। নকশালপন্থীরা বিশ্বাস করেন, যেখানেই শোষণ-নিপীড়ন আছে, সেখানেই বিদ্রোহ হবে। সংকট থাকলেই মানুষ বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসবে। কিন্তু এভাবে বিপ্লব হয় না। কখনই হয় না। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সকলেই দেখিয়েছেন, শুধু মাত্র সংকট থাকলেই বিপ্লব হয় না। ইথিওপিয়া দেশটিতে ভয়ঙ্কর সংকট ও অনাহারের দরুন সেখানকার মানুষের চেহারা কঙ্কালসার হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে বিপ্লব হয়নি। তার বদলে সাধারণ মানুষ ভিক্ষা করা শুরু করেছে। যতক্ষণ না সর্বহারা শ্রেণি সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না। এ কথা আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে। যারা প্রশ্ন তোলে, কেন আমরা সমাজতন্ত্র আনার জন্য সংগ্রাম করব, তাদের এই উত্তরই দিতে হবে। তাদের আশ্বস্ত করতে হবে যে, আবার বিপ্লব হবে, অবশ্যই হবে। আমরা যদি বিপ্লব সাধন না করতে পারি, তাহলে আমরা অপদার্থ, অকার্যকর হিসাবে প্রতিপন্ন হব। কিন্তু তখন কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে। তারা এই সংগ্রামের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে এবং বিপ্লব সফল করবে, কারণ এটাই হল অগ্রগতির সামাজিক প্রক্রিয়া। বিপ্লব হল একটি সামাজিক শক্তি। সর্বহারা শ্রেণির চেতনার মান যখন বাড়বে, তারা যখন নিজেদের সংগঠিত করবে তখনই এটা সম্ভব হবে।

সমাজতন্ত্র উন্নত রূপের গণতন্ত্র দেয়

শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহল — অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে আরও বড় একটি বিভ্রম তৈরি করেছে বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম। এঁদের সঙ্গে সমাজতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে যান, দেখবেন — আপনি যা-ই বলুন, ওঁরা যুক্তি তুলছেন, সমাজতন্ত্রে কোনও গণতন্ত্র নেই। মনে হয় যেন, সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্র না থাকার বিভ্রান্তিটি এঁদের চিন্তায় বদ্ধমূল হয়ে গেছে। তাঁরা মনে করেন, কেবলমাত্র জাতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই গণতন্ত্র থাকতে পারে। এই বিরাট বিভ্রান্তির কারণেই সমাজে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিরোধিতা রয়েছে। তাই এই বিষয়টিকেও গভীরভাবে বুঝতে হবে। গণতন্ত্র কী? ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে গণতন্ত্র। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, গণতন্ত্রের ভিত্তি হল সমতা। সমতা বা সাম্যই গণতন্ত্রের ভিত্তি। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক — সমস্ত ক্ষেত্রে সমতা। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণি সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগান তুলেছিল। এই স্লোগান সেই সময়ে মহান এক বার্তা বহন করে এনেছিল, কারণ সেই সময় সামন্তী প্রভুদের নিরঙ্কুশ শাসনে, রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসনে সাধারণ মানুষের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ সামন্তী শোষণ নিপীড়নের শিকার ছিল। সেই পরিস্থিতিতে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগান সত্যিই মহান ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত বুর্জোয়া শ্রেণি কি সাধারণ মানুষকে সাম্য দিতে পেরেছিল? পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কি সাম্যের কোনও অস্তিত্ব থাকতে পারে? পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেখানে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বৈধতা দেওয়া হয় এবং মানুষের পবিত্র অধিকার বলে স্বীকার করা হয়, সেখানে সাম্যের অস্তিত্ব কি থাকা সম্ভব? গোটা সমাজ, সমাজের সমস্ত সাধারণ মানুষ কি উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক হতে পারে? হতে পারে না। এই ব্যবস্থায় টাটা, বিড়লা, আদানি, আম্বানি, গোয়েঙ্কা ইত্যাদির মতো গুটিকয়েক মানুষই কেবল উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক বনতে পারে। এদের মালিকানাতেই থাকে কল কারখানা, বড় বড় কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি। এটা ঠিকই যে খেটে খাওয়া মানুষ এই সব জায়গাতেই কাজ পায়। কিন্তু এই কাজ পাওয়ার অর্থ কী? পুঁজিপতি মালিকদের কাছে মানুষ তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে। যত কঠিনই শোনাক না কেন, বাস্তব সত্য হল এই যে, পুঁজিপতিরা শ্রমিক শ্রেণির শ্রমশক্তি কিনে নেয়। রুজি-রোজগারের জন্য শ্রমিক শ্রেণি তাদের শ্রমশক্তি মালিকদের কল-কারখানায় বিক্রি করে। যারা শ্রমশক্তি কেনে আর যারা তা বিক্রি করে, তাদের মধ্যে কি সাম্য থাকা সম্ভব? যাঁরা বলেন, শ্রমশক্তির বিক্রেতা ও ক্রেতাদের মধ্যে সাম্য থাকা সম্ভব, হয় তাঁরা অজ্ঞ, অথবা পুঁজিপতি শ্রেণির মতলববাজ দালাল। একেই লেনিন 'মজুরি দাসত্ব' বলে অভিহিত করেছেন এবং বর্তমান ব্যবস্থায় সাম্যের স্লোগানের হাল কী দাঁড়িয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন।

অন্যদিকে, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব নেই। যদিও প্রাথমিক স্তরেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হবে না, কিন্তু ক্রমে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা বিলুপ্ত হবে। উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ, কল-কারখানা, বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র — সব কিছুই সর্বহারা শ্রেণি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। কোনও ব্যক্তির দ্বারা নয়, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও-এর দ্বারা নয়। কায়েম হবে সর্বহারা শ্রেণির শাসন। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। সমাজতন্ত্রে কঠোর আইনের দ্বারা শ্রমিকের শ্রমশক্তি ভাড়া নেওয়া নিষিদ্ধ হবে। সমাজতন্ত্রে শ্রমের বাজারের অস্তিত্ব থাকবে না। শ্রমশক্তি বেচাকেনা করা যাবে না। শ্রমিকরা নিজেরাই উৎপাদনের উপকরণের মালিক, আবার তারা নিজেরাই শ্রমিকের কাজ করবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মতো সমাজতন্ত্রে মালিক ও শ্রমিকের পার্থক্য থাকবে না। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের উদ্দেশ্য হল সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। শ্রমিকদের শোষণ করে, তাদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করেই মুনাফা অর্জন করে মালিক। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফার কোনও প্রশ্নই নেই। সমাজতন্ত্রে উৎপাদন হবে সমাজের ক্রমাগত বাড়তে থাকা প্রয়োজন মেটাবার জন্য। এ জন্যই ক্রমে অধিকতর উৎপাদন হতে থাকবে। উৎপাদনের আওতায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের উৎপাদনগুলিও থাকবে। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উদ্দেশ্য নির্ধারিত হবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে। যেখানে উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, গোটা সমাজই যেখানে এগুলির মালিক, একমাত্র সেখানেই মানুষে মানুষে সাম্য অর্জিত হতে পারে। প্রথম দিকে সমাজতন্ত্রে নিজস্ব ফুলের বা সবজির বাগান ইত্যাদির আকারে কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকবে। ধীরে ধীরে শেষপর্যন্ত এগুলিও থাকবে না। সমস্ত কিছুই সামাজিক মালিকানার আওতায় আসবে। এই কারণেই আমরা বলি, সমাজতন্ত্র হল সাম্যবাদে পৌঁছাবার জন্য সংগ্রামের স্তর। যখন সমস্ত সম্পত্তিই সামাজিক সম্পদ, একমাত্র তখনই প্রকৃত অর্থে সাম্য অর্জিত হতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজ থেকেই ইতিহাসে গণতন্ত্র বা গণতন্ত্রের যুগের সূচনা। সামন্তী যুগে সমতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার কোনও ধারণাই ছিল না। সমাজতন্ত্রে এই ধারণাগুলি পূর্ণতা পায়। এটি হল সমাজের গণতান্ত্রিক স্তর। প্রথমটি হল বুর্জোয়া গণতন্ত্র, দ্বিতীয়টি সর্বহারা গণতন্ত্র। লেনিন দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাস্তবে কোনও গণতন্ত্র নেই, সমাজতন্ত্রেই রয়েছে প্রকৃত গণতন্ত্র। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ মানুষ, যারা মালিক, তাদের গণতন্ত্র আছে, বাকি ৯০ শতাংশ মেহনতি মানুষের নেই। এ হল সংকীর্ণ গণতন্ত্র। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে ১০ শতাংশ পুঁজিপতিকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে ৯০ শতাংশ সাধারণ মানুষ গণতন্ত্র ভোগ করে। ফলে পরিমাপের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের সুযোগ অনেক বেশি। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বুর্জোয়া গণতন্ত্র যেহেতু শোষণমূলক ব্যবস্থাকে রক্ষা করে, তাই রুচি এখানে নিম্নমানের। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র মানুষকে মুক্তি দেয়, মুনাফার লক্ষ্য থেকে উৎপাদনকে মুক্ত করে। এ হল উন্নততর, মহত্তর গণতন্ত্র। তাই সর্বহারা গণতন্ত্র শুধু পরিমাণগত দিক থেকেই বড় নয়, গুণগত মানের দিক থেকেও আরও মহৎ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন বিকাশের পথে সাম্যবাদে পৌঁছাবে, তখন শ্রেণিগুলি বিলুপ্ত হবে, শ্রেণি শাসন থাকবে না, উৎপাদন এত পর্যাপ্ত পরিমাণে হবে যাতে প্রত্যেকেই নিজের চাহিদা পূরণ করতে পারবে। সাম্যবাদে যে নীতির ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হবে তা হল —'প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজন মতো পাবে এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজকে দেবে'। সাম্যবাদে যখন প্রকৃত অর্থে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন গণতন্ত্রের আর কোনও প্রয়োজনই থাকবে না। আলাদা করে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্ন থাকবে না, গণতন্ত্র অর্জনের জন্য সংগ্রামও থাকবে না। এ সব প্রশ্নের কোনও অস্তিত্বই থাকবে না। সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হল এরকমই মহান এক সংগ্রাম। এ সব আমাদের গভীর ভাবে বুঝতে হবে এবং প্রথমে সমাজতন্ত্র ও শেষপর্যন্ত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামের আবর্তে আমাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়, প্রতিবেশীদের যুক্ত করতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা ভারতের মাটিতে বিশেষীকৃত করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। ফলে গভীরে গিয়ে তাঁর চিন্তাধারা অনুধাবন করতে হবে, আত্মস্থ করতে হবে। এ কথা বলেই আমি শেষ করছি।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

ভারত-আমেরিকা নয়া সামরিক চুক্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন আধিপত্য বাড়াবে

ভারত-আমেরিকার নয়া সামরিক চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন—সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সদর দপ্তর পেন্টাগন সম্প্রতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোটের ছোট শরিক ভারতের সাথে সামরিক বোঝাপড়া আরও বাড়াতে "ইন্ডিয়া র‍্যাপিড রি-অ্যাকশন সেল" গঠন করেছে। 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা' বাড়াতে যৌথভাবে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র তৈরির পরিকল্পনাও তারা করেছে, যা আসলে মধ্যপ্রাচ্য সহ এশিয়া ভূখণ্ডে মার্কিন আধিপত্য আরও বৃদ্ধি করবে। এই ঘটনা পরিষ্কারভাবে দেখাচ্ছে যে, উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে ভারত আজ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী চক্রে কত সক্রিয়। এটা শুধু ভারতের জনগণের কাছেই গভীর উদ্বেগের বিষয় নয়, সমগ্র দক্ষিণ-এশীয় জনগণের কাছেই উদ্বেগের।

লক্ষ করার বিষয় যে, মুনাফালোভী ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতি ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির স্বার্থে পূর্বতন কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের পথ অনুসরণ করে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ না বাড়িয়ে ক্রমাগত সামরিক বাজেট বাড়াচ্ছে।

যুদ্ধবাজ আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সামরিক সখ্য বাড়ানোর এই তৎপরতার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি এবং জনসাধারণকে প্রতিবাদে সরব হতে আহ্বান জানাচ্ছি।

১৭ দলের কর্মসূচি বিষয়ে ভুল সংবাদ প্রসঙ্গে

পশ্চিমবাংলায় ১৭টি বামপন্থী দলের যুক্ত আন্দোলন প্রসঙ্গে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেই বিষয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২০ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন —

"১৭ দলের যুক্ত আন্দোলন বিষয়ে সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো সদস্য ও এ রাজ্যের বাম ঐক্যের নেতা কমরেড বিমান বসুর বিবৃতির নামে কিছু সংবাদমাধ্যমে যা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বক্তব্য ও অবস্থান সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

মূলত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির ও সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদী পরিমন্ডল রচনার বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী বহুমুখী চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই পশ্চিমবঙ্গে আমাদের দল বৃহত্তর বাম ঐক্যের শরিক আছে। ২ সেপ্টেম্বর ট্রেড ইউনিয়নগুলি আহূত সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করতেও আমাদের দল সর্বশক্তি দিয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। বাম ঐক্যকে শক্তিশালী করাই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু এটার অর্থ এই নয় যে, সকল ইস্যুতেই আমরা একমত হব ও যুক্ত আন্দোলনে যেতে পারব। যেমন বিগত রাজ্য সরকারের আমলে বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন থেকেই গড়ে ওঠা দলমত নির্বিশেষে গ্রাহকদের মঞ্চ বা সংগঠন 'অ্যাবেকা' অত্যন্ত পরিচিত ও স্বীকৃত সংগঠন, যাদের আন্দোলনকেই আমরা সমর্থন ও শক্তি যোগাব। এ জন্যই আমরা জানিয়েছি ঐ দুটি মূল ইস্যু ছাড়া অন্য যে যে ইস্যুতে আমরা উপযুক্ত মনে করব, সেখানেই কেবল যুক্ত আন্দোলনের শরিক হব। সব ইস্যুতে নয়। ফলে '১৭ দল' বলে উল্লিখিত হলেই তাতে আমাদের দল শরিক, এ কথা ধরে নেওয়া ঠিক নয়।"

প্রকাশিত হয়েছে

মার্কসবাদ লেনিনবাদ শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই মুক্তির পথ
প্রভাস ঘোষ
মূল্য ঃ ৬ টাকা

গণআন্দোলন ও বিপ্লবের প্রয়োজনেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে শক্তিশালী করা দরকার
মানিক মুখার্জী, কৃষ্ণ চক্রবর্তী
রণজিৎ ধর, অসিত ভট্টাচার্য
মূল্য ঃ ৬ টাকা

On Some Ideological and Organisational Questions
Provash Ghosh
Price : Rs. 10

রাজস্থানে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মিছিল

১৯ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের জয়পুরে ডি এস ও-ডি ওয়াই ও-এম এস এস-এর পক্ষ থেকে রাজ্যে মহিলাদের উপর ক্রমাগত বাড়তে থাকা অপরাধ, মদের ব্যাপক প্রসার বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ

আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে
১০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এস ইউ সি আই (সি)

বিহার নির্বাচনে ছটি বামপন্থী দলের যে বাম জোট গড়ে উঠেছে সেই জোটের পক্ষে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এর বাইরে ৪টি আসনে বামপন্থীদের সাথে বন্ধুত্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

জেলা	কেন্দ্র	প্রার্থীর নাম
১। মজফফরপুর	১। পারো	কমরেড নানহক শা
	২। কাঁটি	কমরেড লালবাবু রাই
২। বৈশালী	৩। বৈশালী	কমরেড সিংহেশ্বর ভগৎ
৩। পাটনা	৪। দানাপুর	কমরেড নাতাশা শর্মা
৪। মুঙ্গের	৫। জামালপুর	কমরেড প্রমোদ কুমার
৫। বাঁকা	৬। বেলহার	কমরেড অর্জুন পাল

যে আসনগুলিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বামপন্থী দলগুলির সাথে বন্ধুত্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধ্য হচ্ছে।

১। বৈশালী	১। মহুয়া	কমরেড ললিত কুমার ঘোষ (সিপিআইয়ের সাথে)
২। অরওয়াল	২। কুর্থা	কমরেড রূপেশ কুমার (সিপিআইএমএল- লিবারেশনের সাথে)
৩। মুঙ্গের	৩। তারাপুর	কমরেড কৃষ্ণদেও শা (সিপিআইয়ের সাথে)
৪। ভাগলপুর	৪। নাথনগর	কমরেড দীপক কুমার (সিপিআইএমের সাথে)

বিদ্যুৎ মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো, এম ভি সি এ বাতিল, বিদ্যুৎ কোম্পানির অ্যাকাউন্টস তদন্ত প্রভৃতি দাবিতে
২৩ সেপ্টেম্বর
সি ই এস সি-র
৪ রিজিওনাল অফিসে
অ্যাবেকার ডাকে বিক্ষোভ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org